সাম্প্রতিক কথা

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ২০১০ ইং

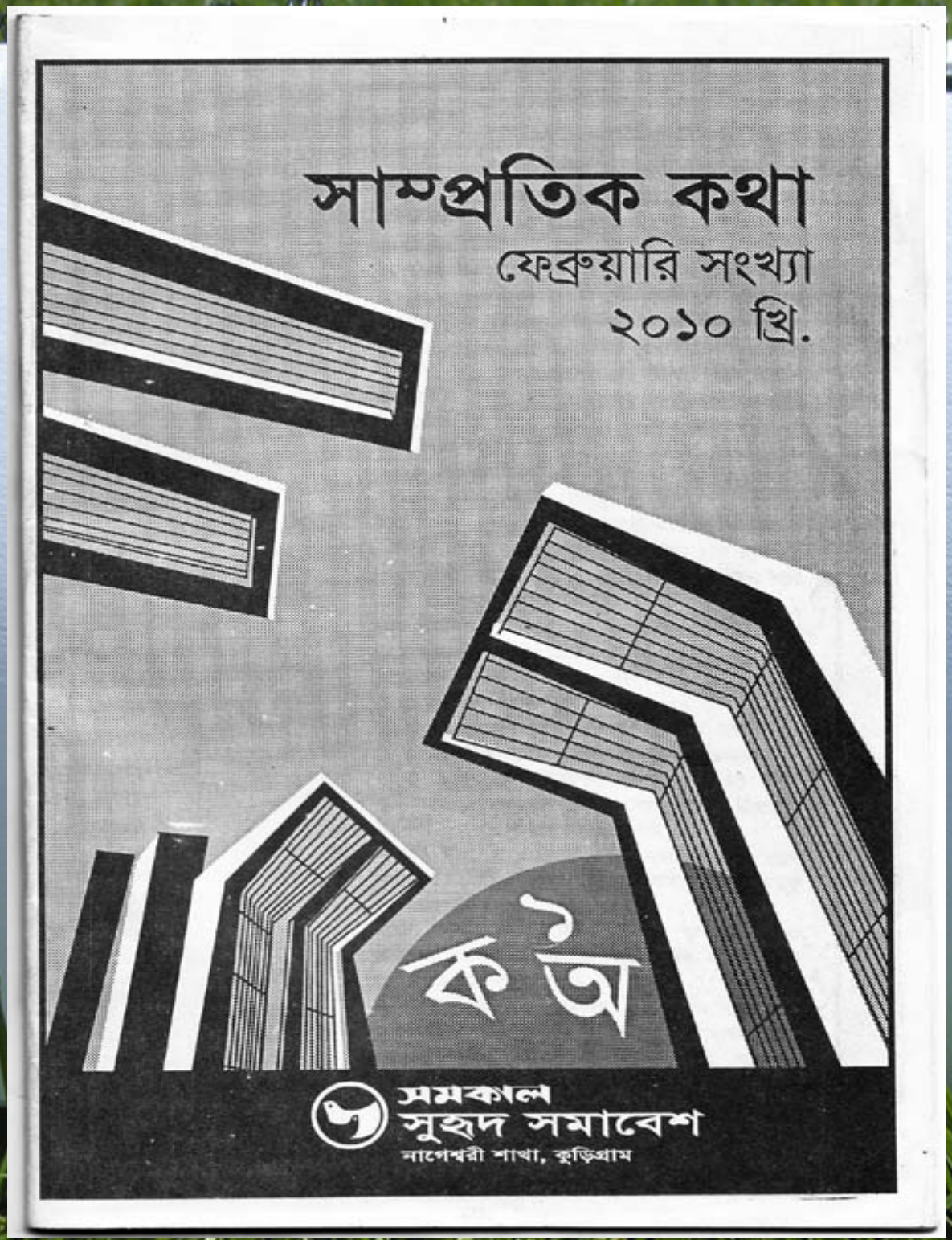
সাম্প্রতিক কথা
ফেব্রুয়ারি সংখ্যা
২০১০ খ্রি.
সমকাল
সুহৃদ সমাবেশ
নাগেশ্বরী শাখা, কুড়িগ্রাম

সাম্প্রতিক কথা
ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ২০১০ খ্রি.

সম্পাদক
গোলাম মওলা সিরাজ

সহযোগী
নয়ন চৌধুরী
আপেল মাহমুদ
হাবিবুর রহমান সুলতান

প্রকাশনা
সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
নাগেশ্বরী শাখা, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১০ খ্রি.

সংখ্যা
তৃতীয়

কম্পোজ
সাইদুল ইসলাম
গোলাম মওলা সিরাজ

যোগাযোগ
সম্পাদক
সাম্প্রতিক কথা
মোবাইল ক্লিনিক
উপজেলা চত্বর
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
০১৭২৪-৯৩১১০১
০১৭৩৬-০০১০১৭
ই-মেইল ঃ
gmoulanet@gmail.com
www.samprotckotha.tk

প্রাত কথা

মাতৃভাষা একটি জনগোষ্ঠির অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জনগোষ্ঠির ভাষার মৃত্যু হলে গোষ্ঠিভূক্ত মানুষের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য। যদিও সে জনগোষ্ঠি মানচিত্রের একটা সীমানা নিয়ে থাকে। যে জাতীর মাতৃভাষা স্বীকৃত সে জাতির আত্ম পরিচয় ও স্বীকৃত।

বাঙালি জাতির মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জন ঘৃণ্য অপচক্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উচ্চারণ। বৈদেশিক শোষক সমষ্টির বাঙালি দাবিয়ে রাখার নানা অপচেষ্টার অন্যতম পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিকে মূলোতপাটন।

বি-জাতির কর্ণধাররা বুঝেছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে পূর্ব বাংলার বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব। সেজন্যই পশ্চিম বাংলার হোতারা পূর্ব বাংলাকে বাকরুদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায়।

কিন্তু অকুতভয় বাঙালি সামরিক সাজ সজ্জাকে তোয়াক্কা না করে নিজেদের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য ওলি গলি রাজপথে নেমে পড়ে। অর্জন করে নিজেদের অস্তিত্ব। বিনিময় করে তাজা রক্ত আর নিস্পাপ প্রাণ।

ভাষা অর্জন কালের পরিক্রমায় উজ্জীবিত করে বাঙালিকে। তৈরি করে বিশ্বের বুক চিরে নতুন মানচিত্র। লাল সবুজের বাংলাদেশ।

তাজা রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে বাংলা জয় হলেও এখনও তা অদম্য। আজও বাংলাদেশে উঁচু শ্রেণীতে প্রাচ্য ভাষাই কদর পায়। মধ্য শ্রেণীর তৃণ্ডির ভাব প্রকাশ করে বাংলা।

বাংলা ভাষী উত্তর সীমান্তের দুর্বল অর্থনীতির জেলা কুড়িগ্রাম। এ জেলারই চৌদিক নদী বেষ্ঠিত উপজেলা নাগেশ্বরী। সফল না হলেও সম্ভাবনাময়ী।

সংস্কৃতি উর্বর এ এলাকার একটি সমষ্টি সমকাল সুহৃদ সমাবেশ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা যার ব্রত।

নানান সেবার মধ্যেও বিশেষ দিনকে মূল্যায়ন করতে প্রকাশনা সাম্প্রতিক কথা'র পথ চলায় প্রতিকূলতাই অধিক। তবুও চলছে। চলবে।

এ সংখ্যার প্রায় লেখা নতুনদের। সম্পাদনাও নিখুঁত নয়। বলা যায় হাতে খড়ি। সংশ্লিষ্ট সহযোগি বিজ্ঞাপন দাতা, লেখক, পাঠক, শুভাকাংখী সবার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদক

ভাষা আন্দোলনে কুড়িগ্রাম

ছমির আমিনুল

বাঙালি জনগোষ্ঠির ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কুড়িগ্রামের ও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

বাংলার কৃতি সন্তান এ.কে ফজলুল হক (শের-ই-বাংলা) ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে অভিভক্ত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বাংলা ও আসাম নিয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিমলীগের সার্থবাদীমহল এ ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি সংশোধনের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য একটি মাত্র স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে '৪৭ সালের ১৮ই জুলাই মধ্য রাতে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাশকৃত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বর দ্বারা '৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যকে পুঁজি করে দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দু'টুকরো ভূখণ্ডের সমন্বয়ের পাকিস্তান নামে এক অদ্ভুদ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মুখের ভাষাই হবে যে রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষা। কিন্তু অদ্ভুদ রাষ্ট্র পাকিস্তানের অদ্ভুদ শাসকরা প্রচলিত সকল নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করে পূর্ব ভূখন্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বাঙালিকে মুখের ভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে মাত্র শতকরা ছয় জন নাগরিকের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, বুকের তাজা রক্তে কালো রাজপথ রঞ্জিত করে দিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রভাষা রূপে।

'৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরূণ অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত তমদ্দুন মজলিশ সর্ব প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। ঐ বছরের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে স্বার্থবাদী পশ্চিম পাকিস্তানীরা উর্দুকে পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করে। এর প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তমদ্দুন মজলিশ। '৪৮ সালে ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজী ও উর্দুকে পাকিস্তানের গণপরিষদের ভাষা হিসাবে অনুমোদন করা হয়। কুড়িগ্রামের কৃতি সন্তান রাজনীতিবিদ কাজী এমদাদুল হক পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই হীন চক্রান্তের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন। এই মহান ব্যক্তির সুযোগ্য নেতৃত্বে কুড়িগ্রামের জনগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী গণপরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনে ইংরেজী ও উর্দুর সাথে সাথে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবী জানান।

বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ই মার্চ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবীতে হরতাল আহবান করে। হরতাল চলাকালীন পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ১৫ মার্চ খাজা নাজিম উদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, এ চুক্তির মূল

বিষয়বস্তু ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হবে এবং গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হবে। অথচ বাঙালিদের ন্যায় সঙ্গত দাবীকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র যন্ত্রটি সৃষ্টির মাত্র আট মাসের মাথায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ '৪৮ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন "Urddu and Urddu Shall be the state language of Pakistan" অদ্ভুদ রাষ্ট্র যন্ত্রটির জনকের অদ্ভুদ সিদ্ধান্ত উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্ররা উভয় জায়গায় এ আদেশের প্রতিবাদ করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবীকে আরও বেগবান করার জন্য জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে স্থানীয় কমিটি গঠন করা হয়।

রাজনীতিবিদ কাজী এমদাদুল হক ও মিয়া আব্দুল হাফিজের প্রচেষ্টায় '৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কুড়িগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীতে ভাষা সংগ্রাম পরিষদে স্থানীয় কমিটি গঠিত হয়। আবুল মনসুর সরকারের দেয়া তথ্যমতে এ কমিটির সভাপতি কাজী এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক মিয়া আব্দুল হাফিজ, এছাড়াও ঐ কমিটিতে ছিলেন আলহাজ্ব রিয়াজ উদ্দীন ভোলা (প্রাক্তন ডিপুটি স্পীকার), কবি সৈয়দ শামসুল হক, আব্দুর রহমান মোক্তার, মনির উদ্দীন আহমেদ, মনসুর মিয়া, কাশেম মোক্তার, নান্টু মিয়া, সোলায়মান আলী, আবুল মনসুর সরকার, রুহুল আমীন প্রমুখ।

ভাষা সংগ্রামীদের আড্ডা স্থল ছিল শহরের সত্যেন বাবুর চায়ের দোকান (ধরলায় নিমজ্জিত বাজারে আম্মাজী হোটেল। বর্তমানে বড় সিমেন্টের দোকান)। এ দু'টি স্থানে সকাল বিকাল পরস্পরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্দোলনের গতিশীলতা রক্ষা করা হতো।

কুড়িগ্রামে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের স্থানীয় কমিটি গঠনের মাত্র কিছুদিন পর মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নদীপথে কড়িগ্রামে আসেন এবং কুড়িগ্রাম সদর, বামনডাঙ্গা (নাগেশ্বরী) ও ভূরুঙ্গামারীতে জনসভা করেন। সভায় তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন "আমি ব্যবস্থাপক সভায় জোর দাবী তুলেছি পূর্ব বাংলা হল বাংলা ভাষাভাষীর দেশ তাই সকলকে বাংলায় বলতে হবে স্পীকারে রুলনিশিও হবে বাংলায়। আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করেই ছাড়ব ইনশাল্লাহ।"

কুড়িগ্রামে বাংলা ভাষার পক্ষে ছিল মুসলিমলীগের প্রগতিশীল অংশ আওয়ামী মুসলিমলীগ, স্বরাজ আন্দোলনের কর্মী ছাত্রলীগ ছাত্র যুবকসহ কুড়িগ্রামের সকল জনসাধারণ। বাঙালির প্রাণের দাবী রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এ দাবীটিকে গণমানুষের কাছে তুলে ধরতে কাজ করত কুড়িগ্রামের বিভিন্ন পালাগানের দল, কিষাণ গানের দল, যাত্রাদল এবং মানবধর্মে বিশ্বাসী বাউলরা। গানের দলে বিভিন্ন পালা গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে হাস্য রসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা দাবীটি তুলে ধরা হতো। ভাষা আন্দোলনে বাউলদের গাওয়া গানও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশ ব্যাপী হরতাল কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কুড়িগ্রামে হরতাল আহবান করা হয়। হরতালের শুরুতে পুলিশ প্রথমত: বাধা প্রদানের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত বাধা দেয়নি। কোন হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটেই হরতাল সফল হলেও ছাত্র যুবকসহ সকলেই উদ্বিগ্ন ঢাকায় কি ঘটেছে। ঢাকার ঘটনার জানার জন্য সকলেই কখনও বা আম্মাজী হোটেলে কখনও বা সত্যেন বাবুর চায়ের দোকানে যাতায়াত করত। ছাত্র নেতাদের জনগণ ভীড় জমিয়ে ঢাকার ঘটনা জানতে চাইতেন। সে সময় ঢাকার সংবাদপত্র কুড়িগ্রামে পৌঁছাতে সময় লাগত ৩০ থেকে ৩২ ঘন্টা। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঢাকার ঘটনা কুড়িগ্রামের জনগণ জানতে পারে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে। সন্ধ্যায় ভাষা সংগ্রাম কমিটি এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ২৫ তারিখ সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হবে। সভা শেষে প্রচার মিছিলের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানিয়ে দেয়া হয় ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। ২৫শে

ফেব্রুয়ারীর হরতালকে সফল করার জন্য সংগ্রাম কমিটির নেতাকর্মীরা শহরের ওলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ৭/৮ শত ছাত্র যুবক ভাষার মিছিলে আসে। মিছিল শুরুর আগে ছাত্ররা মিলিত হয় আম্মাজী হোটেলে। বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় সকাল সাড়ে ৮ টায়। মিছিলটি ঘোষপাড়া ঈদগাহ মাঠ হতে জাহাজ ঘরের কাছে আসতেই পাকিস্তান পন্থী কিছু লোক মিছিলকে প্রতিহত করার জন্য দলবলসহ লাঠি হাতে বাজারের দাদা মোড়ের কাছে ওঁৎ পেতে থাকে। মিছিলটি সামনে আসতেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মিছিলে আক্রমণ করে। ছাত্ররা দোকান পাটের লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণের জবাব দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই বিরোধীরা স্থান ত্যাগ করে। সংঘর্ষে বেশ ক'জন ছাত্রের হাতে পিঠে আঘাত লাগে এবং জখম হয়। ছাত্ররা লাঠি হাতে নিয়ে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করার পর পথসভা করে।

অপরদিকে বিরোধীরা থানায় গিয়ে নালিশ করে। কিন্তু থানার দারোগা ঘটনাস্থলে এসে মামলা না নিয়ে আবার ফিরে যান এবং বলেন ঢাকায় গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে আর তাই পূর্ব বাংলায় ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এসময় ওদের না ক্ষেপানোই ভাল।

২৫ তারিখ থেকে একটানা প্রতিদিনি সন্ধ্যায় মিছিল করেন ছাত্ররা। আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়ে থানা ও গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়লে আপোষ মিমাংসার প্রস্তাব দেয় বিরোধীরা।

ভাষা আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পর কুড়িগ্রামের জনগণের মধ্যে সে বছর শহীদ মিনার তৈরির চিন্তাভাবনা আসেনি। ঢাকা রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনার স্থাপিত হলে ১৯৫৩ সালে ভাষা সংগ্রাম কমিটির ছাত্র যুবকরা স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কাছে শহীদ মিনার তৈরির প্রস্তাব করলে এক পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে তৎকালীন থানার সামনে ফাঁকা জায়গাকে বেছে নিয়ে ইট সংগ্রহ করে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইট কাদার সমন্বয়ে শহীদ মিনার তৈরী করা হয়। শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু করতে না করতেই শত শত মানুষ ভীড় জমায় শহীদ মিনার দেখার জন্য। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভোর হতে না হতেই কুড়িগ্রামের ছাত্র শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের শত শত মানুষ নগ্ন পায়ে ফুল হাতে করে আসেন চির ভাস্কর বাংলা মায়ের বীর সন্তান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। মায়ের ভাষায় কথার বলার আনন্দই যেন তারা প্রথম অনুভব করতে পেরেছেন ঐ দিনেই। প্রতি বছরে ঐ জায়গাটিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহিদ মিনার তৈরি করা হতো। কুড়িগ্রাম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পর স্বাধীনতার আগেই মহাবিদ্যালয় অঙ্গনে স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। স্বাধীনতার পর কুড়িগ্রাম গওহর পার্ক মাঠে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। ১৯৮৫ সালে কুড়িগ্রাম পৌর চেয়ারম্যান কুড়িগ্রাম শহরে ঘোষপাড়া মোড়ে তৈরি করে কুড়িগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। শহীদ মিনার কমপ্লেক্সে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার প্রতিকৃতিসহ পানির ফোঁয়ারা। পরবর্তীতে ঐ স্থানটিতে তৈরি করা হয়েছে একটি পাকা শহীদ মিনার।

শুধু কুড়িগ্রাম শহরে নয়, অন্য নয়টি থানা সদরের প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। প্রায় সকল হাই স্কুল কলেজে রয়েছে নিজস্ব শহীদ মিনার। এছাড়াও শহীদ দিবস পালনের জন্য গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন বাসার সামনে স্বেচ্ছাসেবী সংঘ, ক্রীড়া সংঘ, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নাট্য সংগঠনগুলো তৈরি করে শহীদ মিনার। কুড়িগ্রামের জন মানসে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি শহীধ মিনার চির অম্লান হয়ে আছে।

(প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে)

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

যে সবে বঙ্গেত জন্মি

মোহাম্মদ নজাবত আলী

ফেব্রুয়ারী মাস বাঙালি জাতির আত্মজাগরনের মাস। এই মাসেই বাঙালি জাতি জেগে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের পরিচয় অস্তিত্ব লুকিয়েছিল মাতৃভাষা বাংলার মধ্যেই। তাই তারা মাতৃভাষা বাংলার মধ্যেই তাদের শক্তি, সাহস, আপন ঠিকানা খুঁজে পায়। কেননা ভাষা মানুষের অস্তিত্ব। আর এই অস্তিত্বের বিকাশ সাধন হয় ভাষার মাধ্যমে। তবে অন্য কোন ভাষা নয়। বরং মায়ের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষের বিকাশ ঘটে।

মাতৃভাষা সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ দান। ভাষাই মানুষের প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই প্রত্যেক জাতির আশা আকাংখার প্রতীক তার মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষা আছে। মাতৃভাষা বলতে সাধারণত: মায়ের ভাষাকেই বুঝে থাকি। সুতরাং মাতৃভাষার অবমাননা কোন সভ্য জাতির সন্তানরা মেনে নিতে পারে না। তাই বাঙালি জাতিও '৫২ ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ করে। মাতৃভাষা মর্যাদার লড়াইয়ে আমরা জয়ী হয়েছি বলেই বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে বিশ্ব বরেন্য ব্যক্তিরা আমাদের সালাম, রফিক, শফিকের রক্তে সিক্ত বাংলা ভাষার সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মানে অভিসিক্ত করেছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মানে ভূষিত করায় মাতৃভাষার গুরুত্ব যে বেড়ে গেল তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। একই সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চা করতে হবে। ভাষার যেমন বিকাশ ঘটে চর্চার মধ্যে তেমনি মানুষেরও বিকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে ভাষার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। সঙ্গত কারণে মাতৃভাষা বাংলাই আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্যের মূল চালিকা শক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর ধনী পরিবার তাদের শিশু সন্তানদের জন্মের পর মাতৃভাষা অ, আ, ক, খ এর পরিবর্তে ইংরেজী বর্ণমালা শেখায়। তারপর একটু বড় হওয়ার পর সে সন্তানকে রাজধানী বা দেশের কোন বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়, ফলে কি দাঁড়াল? জন্মের পর থেকেই শিশুটি মাতৃভাষার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলো। ঐ শিশু সন্তানটিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কোন দেশে বাস কর? হয়তো বলতে পারবে। কিন্তু দেশটি কত সালে স্বাধীন হয়, স্বাধীনতার ঘোষক কে বা জাতির পিতার নাম কি বলতে পারবে না। তাহলে শিশুটিকে কি শিখানো হলো? নিজের দেশ বা মাতৃভাষা সম্পর্কে শিশুটিকে অন্ধকারে রাখা হলো। এর মূল কারণ মাতৃভাষা সম্পর্কে আমাদের কেমন যেন তাচ্ছিল্য বোধ। মূলত: ইংরেজী ভাষাকে আমরা অধিক মূল্য বা গুরুত্ব দিতে চাই। এটা আদৌ ঠিক নয়। আমরা অবশ্য বিদেশী ভাষা শিখবো নিজের প্রয়োজনে। কিন্তু নিজ মাতৃভাষার স্বকীয়তাকে

বিসর্জন দিয়ে নয়। এটা আদৌ ঠিক নয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেজ দা'য় বলেছেন "আগে চাই বাংলা ভাষায় গাঁথুনি তারপর ইংরেজী শেখার পত্তন।" কাজেই আমাদের মাতৃভাষার গাঁথুনি যদি শুরুতে দূর্বল হয় তাহলে আমরা বেশি দূর এগুতে পারব না। এটা আমাদের বুঝতে হবে। না বোঝার কারণে আমাদের অনেকের মাতৃভাষার প্রতি একটি অনাগ্রহ জন্মে। একজন মানুষ মাতৃভাষায় যতটা সহজ ও সুন্দরভাবে নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে অন্য কোন ভাষায় তা সম্ভব হয় না। এর অন্যতম কারণ হলো মায়ের সঙ্গে যেমন শিশুর নাড়ির টান, ঠিক তেমনি মাতৃভাষার টানও। মাতৃভাষাই সাহিত্যের অন্যতম বাহন। যে কোন জাতির সাহিত্যের ভান্ডার পূর্ণ হয় তার মাতৃভাষায়। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া কোন জাতির সাহিত্য সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। একারণে বঙ্কিম, শরৎ, নজরুল, সুকান্ত, মীর মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ মুজতবা আলী, রাজা রাম মোহন রায় প্রমোথ চৌধুরী, কায়কোবাদ রবী ঠাকুর, আঃ হাকিম প্রমুখ কবি ও সাহিত্যেকের রচনায় বাংলা ভাষার ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। এক রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব দরবারের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে মাতৃভাষা প্রীতি অনেকের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য পূর্ণতা পায়নি। বিশেষ করে মধ্যযুগে অনেক মুসলমান মুন্সি মাওলানারা বাংলা ভাষাকে সৃষ্টিকর্তার আরাধনার ভাষা বলে স্বীকার করতে চাইতেন না। তারা মনে করত একমাত্র আরবি ভাষাই খোদার ইবাদতের ভাষা। কিন্তু বান্দা যে ভাষাতেই প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুক না কেন তিনি তা শুনবেন ও বুঝবেন। কারণ মহান সৃষ্টিকর্তা সব ভাষাই বোঝেন। তাই মধ্যযুগের অন্যতম বিখ্যাত কবি আব্দুল হাকিম বলেছেন, "সর্ব বাক্য বোঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানি বঙ্গদেশী বাক্য কিংবা যত ইতিবানী।"

তবে বাংলা সাহিত্যের সব কবি সাহিত্যিক মাতৃভাষা বাংলার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সাধনা গেছেন। তাঁদের মধ্যে দু'চার জন বহু ভাষাবিদ ছিলেন। কিন্তু তাদের কেউই প্রথম জীবনে বাংলা ভাষার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা পোষণ করেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি মাইকেল মধু সুদন দত্ত প্রথম জীবনে মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এর মূল কারণ ছিল পাশ্চাত্য জীবন যাপরে প্রবল আকর্ষণ ও ফলশ্রুতিতে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য সাধনায় তীব্র আবেগ তাকে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনায় উদ্বুত্ত করে। তিনি Captive Lady নামে ইংরেজী ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে জীবনের বিচিত্র্য ও কষ্টকর অভিজ্ঞতার আলোকে তার ভুল ভেঙ্গেছিল। বাংলা ভাষায় মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" রচনা করে কুড়িয়ে নিলেন অসামান্য যস খ্যাতি। তার মনে মাতৃভাষা ব্যতিত অন্য কোন ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করা কঠিন। সুতরাং আমাদের প্রথমেই মাতৃভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। আমাদের হৃদয়ের চেতনা শক্তি দিয়ে মাতৃভাষা চর্চা করতে হবে।

আমরা যেন নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি স্বকীয়তাকে বিক্রিয়ে না দিই। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে ইংরেজী ভাষাকে বাংলার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমরা সবকিছু বিশেষ করে আমাদের সমাজে যারা ক্ষমতাবান ব্যক্তি তারা এটাকে দিয়ে

রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু চালাতে চায়। অফিস আদালতের ভাষা হবে বাংলা। কিন্তু নিম্ন আদালতগুলোতে বাংলার কিছু কার্যক্রম চালু হলেও বাংলা ভাষার উপর গুরুত্ব চর্চা বা দখল না থাকায় অনেকে মূল কাজগুলো ইংরেজীতে সম্পন্ন করছেন। এর পিছনে রয়েছে বাংলার আইন পুস্তক রচনার অভাব। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যবধি আইন বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত না হয়ে বরং সংকোচিত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশ করা প্রয়োজন। ভাষার উন্নতি কিন্তু ভাষা নিজে নিজে করতে পারে না। কারণ ভাষার নিজস্ব কোন গতি নেই। যে জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে তার প্রতিভা অনুযায়ী ভাষার বিকাশ ঘটে।

আমরা যদি উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব তাদের নিজের দেশের উন্নতির সাথে সাথে তাদের ভাষার উন্নতি করেছেন। ভাষার বিকাশ ঘটে বিচিত্র্য ব্যবহারের ফলে। বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকাগুলোতে যারা কাজ করছেন তারা যদি বাংলা ভাষায় বই লিখেন তাহলে বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশ ঘটবে। যা হোক বাংলা ভাষা বিকাশ ও চর্চার জন্য বাংলা একাডেমীকে আরও তৎপর হওয়া উচিত।

মাতৃভাষায় অবগাহন করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে গভীরভাবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত মাতৃভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে যার যার স্ব-স্ব অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা। বিশ্ববাসী যে দুর্লভ সম্মান দিয়েছে সে সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। দেশপ্রেম যেমন ঈমানের অংগ তেমনি ভাষা প্রেমও। কারণ মাতৃভাষাকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম গড়ে ওঠে।

এই মহান দিবসে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। যিনি জাতি সংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে করেছেন গৌরবান্বিত। স্মরণ করছি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথকে। যিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাংলাকে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আরও স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমূখ ভাষা শহীদদের। যাদের পবিত্র রক্তের সিঁড়ি বেয়ে ২১ আজ "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি ধন্য হয়েছে। আসুন আজকের এ মহান দিনে মাতৃভাষার ও দেশপ্রেমের শপথ গ্রহণ করি।

দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

আমাদের একুশ

নয়ন চৌধুরী

২১ ফেব্রুয়ারী বাঙালির জাতীয় জীবনের এক গৌরব গাঁথা অধ্যায়। সকল চেতনার মূল উৎস হচ্ছে এই দিনটি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐতিহাসিক দিন এই ২১।

ইংরেজ শাসন শোষন থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু বাঙালিদের ভাগ্যকে বৃটিশরা ছেড়ে দেয় পাকিস্তানের হাতে। শাসন ক্ষমতা পেয়ে পশ্চিমা শাসক গোষ্টি পূর্ব বাংলার মানুষের উপর তাদের শোষনের যাতাকল চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লেগে পড়ে। এ ষড়যন্ত্রের প্রধান ছিল বাঙালিদের মুখের ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র। বাঙালি জাতি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানালে তা অস্বীকার করে পশ্চিমা শাসকরা। কিন্তু বাঙালি জাতি শুরু থেকে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকে। যেকোন সময় রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকে। বাংলা ভাষার উপর প্রকাশ্যে আঘাত হানে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্বেও তিনি ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এ ঘোষণায় এদেশের মানুষের গর্জে ওঠে। দাবী জানায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিল, সমাবেশের মাধ্যমে জিন্নাহর এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ক্ষমতাশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এ মতামতের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে বরং তারা দমন পীড়ন চালিয়ে যায় এদেশের মানুষের উপর।

সরকারী দমন পীড়ন যতই বাড়তে থাকে ছাত্র জনতারা ততই প্রতিবাদ মূখর হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ এর ১২ মার্চে ছাত্রদের আহবানে ধর্মঘট পালন ও বিক্ষোপ করলে তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এতে ছাত্র জনতারা পুনরায় গর্জে ওঠে, আন্দোলনে নামে। ২০ জানুয়ারী পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ঢাকাসহ সারাদেশে আবারও শ্লোগান ওঠে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়া চলবে না"। তখন শাসকগোষ্টি বেছে নেয় নির্যাতনের পথ। তারপর ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে পাকিস্তানী সরকার। অপরদিকে ছাত্র জনতার ডাকে ২১ শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে হয় ছাত্র সমাবেশ। সমাবেশ থেকে বেড়িয়ে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের গ্রেফতারী। তখন ছাত্ররা গণ পরিষদ ভবনের সামনে একত্রিত হয়। বিকেল ৩ টায় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা থাকলে এক

পর্যায়ে ছাত্ররা পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে গণ পরিষদ ভবনের চত্বরে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এসময় পুলিশ হঠাৎ করে গুলি ছুড়লে প্রথম দফায় রফিক ও জব্বার দ্বিতীয় দফায় বরকত ও সালাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সারাদেশ।

শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি। ১৯৫৩ সালে গণ পরিষদের বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে। শহীদের রক্তে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

২১ ই বাঙালি স্বাধীনতার উৎস। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সেও ছিল ২১ এর প্রতিফলন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে টালবাহনা শুরু করে। আবারও শুরু হয় আন্দোলন। বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। ৭১ এর ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ অনেকটা পৌছে দেয় অভিষ্ট লক্ষ্যে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যে ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানীরা নির্বিচারে হত্যা করে বাঙালিদের। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম ও ত্রিশ লক্ষ শহীদের তাজা প্রাণ হারিয়ে দেয়। চলে আসে স্বাধীনতা। পশ্চিমারা পরাজয় মেনে নিয়ে চলে যায় এদেশ থেকে।

কিন্তু যে ভাষার জন্য রক্ত দিতে হয়েছে সেই ভাষাকে তথা ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা ইতস্তত করি। এই প্রজন্ম কিংবা আমরা বলতেই পারি না ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা তারিখটি কত। যা ছিল ১৩৫৮ সালের ৮ই ফাল্গুন।

আজ আমরা স্বাধীন জাতি। সেই দিন এদেশকে স্বাধীন করতে যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল জীবন বাজি রেখেছিল তাদেরকে আমরা কতটুকু দিতে পারছি। দেশ স্বাধীন হয়েও একজন মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষুক বেশে ভিক্ষা করে বেড়ায়। একজন মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফনের নিশ্চয়তাও পায় না।

আর একজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধার নামে বরাদ্দকৃত টাকা পায়। আবার অনেক বেজন্মাও আজকাল গাল ফুলিয়ে বলে- সেটা ছিল নাকি একটা গৃহযুদ্ধ। প্রশ্ন তোলা হয় স্বাধীনতার ঘোষককে নিয়ে। আমাদের প্রজন্মকে শেখানো হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ তথা দেশ স্বাধীনের বিকৃত ইতিহাস।

হায় দেশ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ। এরকম হওয়া উচিৎ নয়। আসুন আমরা সবাই ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সম্মান জানাই। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের বিকৃত না করি। প্রজন্মকে জানাই সঠিক ইতিহাস। প্রতিহত করি যুদ্ধাপরাধীদের। দেশকে গড়ি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

হাফিজুর রহমান হৃদয়

তৃষ্ণা-ক্ষুধা

চলবে কি এ সমাজ! বাঁচবে কি জাতি!
শোসকের শোষণ দিন আর রাতি ।
অশিক্ষার কলেরায় জনজীবন ভুগছে,
জ্ঞান আলো নিভিয়ে আন্ধারে ডুবছে ।
ঘাম ঝড়ে গা থেকে ঝলসানো দুপুরে,
শ্রমিক পায়না দাম ঠিকমত বাপুরে ।
মার কত খাবে আর অনাহারী দুর্বল,
আহাজারী করে কত ফেলবে চোখের জল ।
আকাশে ধ্বনিত হয় ক্রোন্দন চিৎকার,
নীড় হারা পাখির মত শুধুই হাহাকার ।
বিমর্ষ নির্বাক তাকিয়ে থাকে আকাশে,
স্বপ্নের গড়াগড়ি চোখ তার ফেকাসে ।
বন্দী মানুষ বাঁচতে চায় স্বপ্নীল সমাজে,
দাসত্ব থেকে মুক্তি চায় প্রকৃতির কাছে ক্ষমা যে ।
ভুলতে চায় দুঃখ বহাতে চায় সুখ,
প্রেমবাণী শুনতে চায় আশায় বেঁধে বুক ।
সব ভুলে বাঁচতে চায় পেতে নতুনের সাড়া,
চারিদিকে ছড়াতে চায় চেতনা শান্তির ধারা ।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ।

হাবিবুর রহমান সুলতান

উক্তি

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল,
গোলা ভরে দিই আমি কত শস্য ফল ।
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি বা তার কাজ,
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু নিচু,
সে কথা আমি বুঝতে পারি না কিছু ।
গিড়ি কহে সব হলে সমতল পাড়া,
নামিত কি ঝরনার সুমধুর ধারা ।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ।

মতিউর রহামান-সাগর

প্রিয় বিষন্ন মুখ

প্রিয় বিষন্ন মুখ;
ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব দেখবে বলে
তোমার সর্বগ্রাসী জেদ আমাকে; এই
বিষদ কোলাহলের রাংতা সন্ধ্যায়
আনমনা করে চলেছে বার বার ।

অত:পর বেফাঁস বন্ধ্যাত্ব যদিও
তোমার হাত ছুঁইয়ে নামা গ্রহ-নক্ষত্রের
অভিশাপে;ফের অনাবৃত ছন্দে
সরীসৃপের অভ্যস্ত খোলস বদলানোর কসরত ।
এখন বিপন্ন জল, জলের শরীর
গড়তে গড়তে রেখা বিন্দু আমার
মুখে নদী চিত্র অবিরাম ।

তোমার খোঁপায় সূর্য উঠছে ফের; ফের ।
দুটো ফড়িং কিংবা বনশিমুলের
উচ্চভিলাসী পক্ষপাতের আলো-আঁধারি
এসে লাগছে আমার ঠুংরিতে ।
টের পাচ্ছ, বিষাদ?

এখন হন্তারক কিংবা যিশুর আস্বাস
দূর ব্রডগেজের মানচিত্রের মতো মনে হয় ।
মনে হয় কৃষ্টিকাল বাড়তে বাড়তে
ফেরাউন ফের সবাক হবেন, কিংবা
জল ডেবে নেবে মূসার ব্যাপক সদল!

এখানে বর্ষা এবং এখানে শরৎ
বিষন্ন মুখ,
এখানে অন্তর্যামী ধূসর একশত ছিয়াশী ঋতু ।

তবু এই যে,
রাংতা সন্ধ্যায় আনমনা হতে হতে
তোমার জেদ আর বেহাগ ছেনে
আমার গ্লাসে, কানা ছুঁইয়ে
আমি হেমলক দ্রবণে রাখছি পুরু ঠোঁট
আর দিব্যি আছি বেঁচে বর্তে ।
তোমার স্বাস্থ্য করছি পান ।
ভালো থেকো জেদে থেকো
থেকো দাঁত-মুখ খিচানো ধ্বংস-গুহায়
অমলিন বিশুদ্ধ বিষাদে ।।

পরিচিতা

গোলাম মওলা সিরাজ

গ্রীলের তৈরী দরজাটা পার হয়ে চয়ন দেখতে পেল তার ম্যাডাম বারান্দায় চেয়ারে বসে খবরের কাগজ দেখছে। সামনে টেবিল ও চেয়ার সাজানো। চয়ন গিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে পরে। জড়ো-সড়ো হওয়ার একটা কারণও আছে। কারণটা হলো আজ সে পড়তে এসেছে দেরিতে খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে চশমার উপর দিয়ে চয়নের দিক তাকিয়ে বলে ম্যাডাম-

কি ব্যাপার চয়ন আজ এতো দেরি হলো কেন ?

ম্যাডামের কথা জমলে চয়ন বলে-

ম্যাডাম আজ আমাদের বাসায় আমার মামা এসছে।

চয়নের কথার উত্তরে খবরের কাগজে চোখ রেখেই ম্যাডাম আবার বলে-

মামার সাথে গল্প করতে এতো দেরি, তাই না !

তখন ব্যাগ থেকে বই খাতা বের করছিল চয়ন। ম্যাডামের কথা শেষে-

জ্বী ম্যাডাম, বলে বই খুলতে থাকে সে। বই খুলে পড়া শুরু করে। ম্যাডাম খবরের কাগজ রেখে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে আবার চোখ দু'টো ফেরায় খবরের কাগজ।

আজ পড়ায় তেমন মন নেই চয়নের। পড়ার মাঝে অসংখ্য বার থেমে যাচ্ছে, আর পড়া হারিয়ে ফেলছে। ব্যাপারটি নজরে পরে ম্যাডামের, দ্যখে চয়নের দিকে। পড়া থামিয়ে ম্যাডামের দিকে আড়চোখে তাকায় চয়ন। ম্যাডাম বুঝতে পেরে একটু ধমকের সাথে বলে-

আজ তোমার পড়ায় মন নেই, কারণ কি?

ম্যাডামের কথায়-

না ম্যাডাম,

বলে চয়ন পড়তে থাকে মনোযোগের ভান করে। ম্যাডাম দেখতে দেখতে আবারো হাতে নেয় খবরের কাগজ খানা।

চয়ন বাংলা শেষ করে ইংরেজী হাতের লেখা এগিয়ে দেয় ম্যাডামের কাছে। ম্যাডাম ভালো করে দেখতে থাকে লেখা গুলোকে। এমন সময় চয়ন বলে-

ম্যাডাম আজ আর আমি পড়ব না, বাসায় যাবো।

ম্যাডাম মাথা তুলে তাকায় চয়নের দিকে বলে-

বাসায় যাবে ? মাথা নারে চয়ন।

আচ্ছা ঠিক আছে,

বলে খাতাটা এগিয়ে দেয় ম্যাডামকে সালাম জানিয়ে দ্রুত চলে যায় বাসার দিকে।

পরের দিন সময় মত আসে চয়ন। সেদিন ম্যাডাম একটা খাতার কাজ সারছিলো, চয়নকে দেখে খাতার কাজ তুলে রাখে। পড়তে বসে সেদিনো মন দিয়ে পড়ে না চয়ন। বারবার পড়া থামিয়ে গ্রীলের দরজাটার দিকে তাকায়। ম্যাডাম বুঝতে পেরে নিজেও এবার দরজাটার দিকে দেখে বলে-

কি ব্যাপার, তুমি বার-বার গেটের দিকে তাকাচ্ছো কারণ কি, ওখানে কি কেউ আছে ? ম্যাডামের কথা জমতে না জমতেই সে বলে-

জ্বী ম্যাডাম, ওখানে আমার মামা। চয়নের কথা শুনে ম্যাডাম যেন কেমন হয়ে যায়। দ্রুত দরজার দিকে দেখে বলে-

সে কি তোমার মামা ! বাইরে রেখে এসেছো কেন, ভিতরে নিয়ে আসতে পারনি ? চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে চয়ন বলে-

আমি নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু মামা আসেনি। ম্যাডাম আবারো বলে-

কেন?

কোন জবাব দেয়না চয়ন। জবাব না পেয়ে আবারও বলে ম্যাডাম-

আমি ডাকলে তোমার বাবা আসবে?

দ্রুত জবাব দেয় চয়ন-

আসবে।

চয়নের কথায় একটু হাসি দেয় ম্যাডাম, হাসি দিয়ে বলে-

তুমি কি করে জানলে আমি ডাকলে তোমার মামা আসবে ?

ম্যাডামের কথার জবাব দিতে দেরি হয় না চয়নের, বলে-

আমার মামা বলেছে, তিনি মেয়ে মানুষের কথা রাখতে চেষ্টা করেন।

চয়নের কথায় একটু শব্দ করে হাসে ম্যাডাম। হাসিতে লজ্জা পায় চয়ন। ম্যাডাম তা বুঝতে পেরে বলে-

যাও তোমার মামাকে ডেকে নিয়ে এসো। আদেশ পেয়ে আচ্ছা, বলে দৌড়ে বাসার বাইরে যায় চয়ন।

তখন রাস্তার পাশের একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ দেখছে ওর মামা। চয়ন এসে মামার পাশে দাঁড়াতেই মামা মাথা তুলে বলে-

কি পড়া শেষ হলো। মামার কথা থামিয়ে দিয়ে চয়ন বলে-

না মামা ম্যাডাম তোমাকে ভিতরে ডাকছে। চয়নের কথায় আশ্চর্য না হয়ে পারে না ওর মামা, বলে-

তোমার ম্যাডাম আমাকে ডাকছে কেন, তুমি উনি আমাকে চেনে ?

মাথা নারে চয়ন, বলে-

না আমি বলেছি।

আচ্ছা তুমি যাও আমি যাব না- একথা বলে মামা। মামার কথায় প্রায় কেদেঁ ফেলে চয়ন। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে-

আমি যে বলেছি তুমি যাবে।

তখন চয়নকে বোঝাতে চেষ্টা করে মামা সে বুঝতে চায় না। আবারো বলে-

মামা আমি আরো বলেছি, আমার মামা মেয়ে মানুষের কথা খুব মূল্যায়ন করে। এ কথা শুনে হাসতে হাসতে বলে ওর মামা-

তাই নাকি। সেই সাথে চয়নের চোখের দিকে দেখে পানি আসা ভাব। অবশেষে সম্মানিত জানিয়ে হাতের কাছে রাখা ক্র্যাচটা তুলে নিয়ে তাতে ভর করে চলে যায় চয়নের সাথে।

এদিকে চয়ন বের হওয়ার পরেই ম্যাডাম চলে যায় রান্না ঘরে। গিয়ে নিজেই নাস্তার ট্রে সাজিয়ে কাজের মেয়েকে নিয়ে আসতে বলে চলে আসে বারান্দায়।

ম্যাডামকে দেখে তরিঘরি করে স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়ায় চয়নের মামা। তাঁকে উঠতে বারণ করতে গিয়ে থমকে যায় ম্যাডাম। আর কোন কথা বলতে পারে না। তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ি ভরা মুখ মন্ডল। দেখে কিছু খোঁজার চেষ্টা করে। চয়নের মামার চেহারাটা চেনা-চেনা মনে হয় তার। আপাদ মস্তক দেখে নেয় এক বার। চেহারাটা বেশ। আবার ডান পায়ের দিকে তাকাতেই বিষন্নতার ভাব আসে চোখে মুখে। সবকিছু এরিয়ে বলে-

আরে বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

কোন কথা না বলে বসে পরে চয়নের মামা। নিজেও গম্ভীর। বসে মুখ তুলে তাকায় ম্যাডামের দিকে। ম্যাডামের কথাগুলোকে অনেক আগের চেনা মনে হয় তার। মুখটাকেও খুব পরিচিত মনে হয় নিজের কাছে। ভাবনা আসে এমন কোন মানুষের সাথে তার নিজের কোন পরিচয় ছিল কি না। খোঁজ মেলেনা। নীরব থাকে কিছুক্ষণ। নীরবতা ভাঙ্গে ম্যাডাম বলে-

কবে এসেছেন ?

ম্যাডামের কথার উত্তর দেয় চয়নের মামা বলে-

আজই।

আবারো ম্যাডাম বলে-

আপনার বাসা ?

উত্তর অঞ্চল, সোজা জবাব দেয় চয়নের মামা।

আপনি কি করেন ? ম্যাডামের এ প্রশ্নে একটু হেসে নিজের পঙ্গু পা'টার দিকে তাকিয়ে বলে-

আমি আর কি করব, আমায় তো দেখতে পাচ্ছেন, এই শরীর নিয়ে কি করা সম্ভব ? উত্তরটা খুব খারাপ লাগে ম্যাডামের। মনে মনে ভাবে প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। কিন্তু চয়নের মামার কথা গুলো শুনে অনেক প্রশ্ন উঁকি দেয় ম্যাডামের মনে।

এমন সময় নাস্তার ট্রে নিয়ে আসে একটি মেয়ে। চায়ের কাপটা হাতে তুলে দেয় ম্যাডাম। দু-জনেই চুমুক দেয় চায়ের কাপে। দু-জনার মনে নানা ভাবনা। ম্যাডাম ভাবনায় অস্থির প্রায়। ভেবেই পাচ্ছে না, কেন তার এমন লাগছে। লোকটির মুখে দাড়ি, পঙ্গুত্ত, সব কিছুই অন্য রকম লাগে। এত ভাবনার মাঝে একবার স্থির করে, তার পঙ্গুত্তের কথাটা জিজ্ঞাসা করবে। আবার ভাবে, যদি কষ্ট পায় ! আবার মনে মনে ভাবে জানতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটি ছুড়ে মারে, বলে-

আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাইব, যদি আপনি... কথাটি শেষ করতে না দিয়ে চয়নের মামা নিজেই বলে-

আমার কাছে ! ঠিক আছে বলুন। একটু সময় নেয় ম্যাডাম। তারপর বলে-

আপনার এই অবস্থা কি করে হল, বলবেন ?

ম্যাডামের কথায় একটা অদ্ভুদ হাসি দেয় চয়নের মামা। হেসে বলে-

কোন অবস্থার কথা বলছেন, এই পা ! বলেই তাকায় নিজের পঙ্গু পা'টার দিকে। কিছু বলে না ম্যাডাম, শুধু মাথা নেড়ে হ্যাঁ সম্মতি জানায়। হাস্য মুখে আকাশ পানে তাকায় চয়নের মামা। আস্তে-আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ খানা। অতীতে চলে যায় তার মনের দৃষ্টি। একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলে-

সে অনেক কথা, একটা লম্বা ইতিহাস। নজরটা ফেরায় ম্যাডামের দিকে, বলে-

এত কথা শোনার সময় আপনার হাতে নেই।

কিন্তু ছাড়তে চায় না ম্যাডাম, জোর দিয়ে বলে-

আমার যথেষ্ট সময় আছে, বলুন।

আর না করতে পারে না চয়নের মামা। একটু সময় নিয়ে আকাশ পানে চেয়ে বলতে শুরু করে-

তখন ১৯৪৭ সাল। সবে মাত্র আই.এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হলাম। তখন শুরু হলো দু'টি জাতির মধ্যে ভাষা নিয়ে দম্ভ। তবে তা শুধু লেখা- লেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো, দৈনিক পত্রিকাগুলোতে অনেক নিবন্ধ-প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে লাগল। তন্মধ্যে অন্যতম একটি নিবন্ধে স্যার ডঃ এনামুল হক লিখলেন- উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু।

এই কথাগুলো আমরা কতিপয় ছাত্র ভাবতে লাগলাম। খুঁজতে লাগলাম এর সমাধান কোথায়। পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করা যায় কিভাবে।

এতো সব ভাবতে কেটে গেল একটি বছর। গঠন হলো "রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদ" এবং ১৯৪৮ এর ৪ জানুয়ারী ডাকা হলো হরতাল। সেই হরতাল সমর্থন করতে গিয়ে কারা বরণ করলেন আমাদের অনেক স্যারসহ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাতে আরো ক্ষেপে গেল ছাত্ররা। তার মাঝে আবার ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় জিন্নাহ সাহেবের কথা- "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। আবার ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তার একই কথা।

আমরা ছাত্ররা এ কথাটিকে মানতে পারলাম না। কয়েকজন ছাত্র অনুষ্ঠান ত্যাগ করলাম এবং রাতে জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তখনও তিনি বলেন "পাকিস্তানের সংহতির প্রয়োজনে দরকার হলে তোমাদের মাতৃভাষা পরিবর্ত করতে হবে।" সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনের কথা আলোচনা করা হলো। একথা জানতে পেরে ফন্দি আটলেন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন। সিনিয়র নেতাদের সাথে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করে বললেন- "পূর্ব বাংলায় ইংরেজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষায়নে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করা হবে।"

কিন্তু ৪ টি বছর কেটে গেলেও তাদের কোন কার্যক্রম না দেখে ছাত্ররা আবারো আন্দোলন শুরু করে ভাষার দাবিতে। ১৯৫২ তে আমরা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। তখন আন্দোলনে গরম রাজপথ। খাজা নাজিম উদ্দিন ৮ দফা চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে নিখিল মুসলিমলীগ অধিবেশনে ২৫ জানুয়ারী জিন্নাহ সাহেবের মত বললেন- "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" তখনই আন্দোলন ডাকলো- "রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ"। আন্দোলনের ঝড় প্রসারিত হলো সারা দেশে।

৩০ জানুয়ারী প্রতিবাদ সভায় কর্মসূচী নেওয়া হলো। ৪ ফেব্রুয়ারী দেশ ব্যাপী হরতাল পালিত হবে এবং ২১ ফেব্রুয়ারী প্রদেশ ব্যাপী "রাষ্ট্রভাষা দিবস" পালিত হবে।

এ কথাগুলো চয়নের মামা যখন বলে, তখন তার শরীরের লোমগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়। শিউরে উঠে সমস্ত শরীর। কথা শেষ করে তাকায় ম্যাডামের দিকে। ম্যাডামের চোখে তখন জল ছলছল করে। অধীর হয়ে শুনে চয়নের মামার কথাগুলো। চয়নের মামা কথা থামাতেই বলে উঠে ম্যাডাম-

তারপর !

নরজটা ফেরায় চয়নের মামা। আবার বলতে থাকে-আমরা তো সবসময় সব কাজেই থাকতাম। হরতাল পালিত হল, পতাকা উত্তোলন হলো, পথ সভা করা হলো। অন্যপাশে আন্দোলন বানচাল করার জন্য জিন্নাহ সাহেব অনেক ভয়ভীতি দেখালেন এবং সারা ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করলেন। আমরা ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নামলাম। বিশাল মিছিল বের হল।

কলাভবন হতে কিছুদুর সামনে এগুতেই পাকিস্তানের লেলিয়ে দেয়া পুলিশরা গুলি ছুড়লো মিছিলের উপর। বৃষ্টির মত বন্দুকের গুলি আসতে লাগল মিছিলে। পাশের অনেকে ঢলে পড়ল পিচঢালা রাস্তায়। রক্ত গড়িয়ে যেতে লাগল রাস্তা হতে। আমার সারা শরীর রক্তের আল্পনায় লাল হয়ে গেল। তবুও আমরা থামলাম না।

চলতে লাগলাম সামনে। হঠাৎ কখন যে একটা গুলি এসে এই পায়ে ঢুকেছে, তা বুঝতে পারলাম না। ঢলে পড়েছিলাম রাস্তায়।

পরের দিন বেলা ১২ টায় আমার জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলে দেখি আমি হাসপাতালের বেডে শুইয়ে আছি। পাশের বেডে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি লাশ। পরোক্ষণে জানলাম, ওটা সফিউরের লাশ। অল্প কিছুক্ষণ আগে সে মারা গেছে। অপর পাশে এক কিশোর ও রিক্সাওয়ালা আউয়ালের লাশ।

তাদের দেখে আমার বুক ডুকরে উঠলো। বুকে-পাঁজোরে শত বন্দুকের গুলি বেধাঁর অনুভব হলো। আমার মন বলতে লাগল আমিও কেন ওদের সাথে শহীদ হতে পারলাম না। তারপর পা তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলাম আমার পায়ের অবস্থা। সেই থেকে আমি পঙ্গু। আমার.....

বাকি কথাটা আর বলতে দেয় না ম্যাডাম। তড়িৎ গতিতে চেয়ার থেকে উঠে বলে-

আপনার নামটা ?

এই প্রশ্নে নিজেকে পাল্টে নেয় চয়নের মামা। ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বলে-

আমার নাম শাহেদ।

নিজের নামটা বলে তাকায় ম্যাডামের দিকে। দেখে অবাক হয়, দেখতে পায় ম্যাডামের দু'চোখ হতে দর-দর করে জল ঝড়ছে। শুধু তাই নয়, কষ্ট সমীরণে দু'চোখে ছলাত-ছলাত ঢেউ উথলে পড়ছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শত কথার ছোঁয়ায় নড়ছে ঠোঁট দু'টো। মনে হয় কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। এমন দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না চয়নের মামা। অজান্তে জমা নিজের চোখের কোণার জল ফোঁটা মুছে নিয়ে বলে-

আপনি কাঁদছেন ?

আস্তে করে চেয়ারে বসে পরে ম্যাডাম। হাতের খবরের কাগজ খানা ফসকে পরে হাত থেকে। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলে-

তুমি শাহেদ ! তোমার এই অবস্থা !

একটু নীরব থাকে ম্যাডাম। আবার ক্ষীণ স্বরে বলে-

তুমি অনেক কথা লুকিয়ে গেলে কেন ?

ম্যাডামের কথায় চয়নের মামার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরে প্রায়। নীরব থাকে কিছুক্ষণ। ভাবে কে এই মহিলা। আবার আমাকে তুমি করে বলছে, কেন বা আমার জন্য তার এত দুঃখ পাওয়া। এত সব ভাবতে ভাবতে বলে ফেলে-

আপনি এমন করছেন কেন ? আপনি মনে হয় ভুল করছেন। আর আমি তো আমার কথায় কিছুই লুকাইনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ম্যাডাম। কাপড়ের আঁচল তুলে চোখ দু'টো মুছে নিয়ে বলে-

তুমি লুকিয়েছো শাহেদ, তুমি অনেক কিছুই লুকিয়েছো। আমাকে তোমার মনে নেই। তুমি যখন থার্ড ইয়ারে, তখন তোমার সাথে আমার পরিচয় হয় একটা গল্প লেখার মাধ্যমে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের একটা ম্যাগাজিনে আমার লেখা একটা গল্প তোমার ভাল লাগে। আমাকে খুজে বের

করে পরিচয় নিলে। তার পর তোমার সেই মিছিলের পূর্ব মূহুর্তে তোমাকে অনেক বার পিছন থেকে ডাকলাম। তুমি না শুনে চলে গেলে।

আবরো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ম্যাডাম বলে-

সেখান থেকে ফিরে দেখি বাবা অস্থির হয়ে বসে আছেন আমার হোষ্টেল রুমে। গ্রাম থেকে এসেছেন আমাকে নেয়ার জন্য। চলে আসি বাবার সঙ্গে।

আর কিছু বলতে পারেন না ম্যাডাম। কেঁদে ফেলে। শাহেদও কেঁদে ফেলে। ম্যাডামের এক একটি কথা যেন সেল হয়ে বিধল তাঁর বুকে-পাজোঁরে। অনেক দিন পর আবারো মনে পরে পুরোনো কিছু স্মৃতি। চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করে সেই পরিচিতার কথা। মনে পড়ে যায়। সে তো সোমা ! চোখ খুলে ম্যাডামকে দেখতে দেখতে বলে-

তুমি সোমা ?

একথা শুনেই আবারো কেঁদে ফেলে ম্যাডাম। কাঁদতে কাঁদতে বলে-

হ্যাঁ, আমি সোমা। আমি সেই সোমা।

তাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে হাতজোর করে বলে চয়নের মামা-

প্লীজ সোমা কান্না থামাও কাঁদছো কেন? এটাই তো আমাদের বড় পাওয়া। তখন দু'জনার মাঝে যে পবিত্র প্রেমের ভ্রুণ জন্ম নিয়েছিল তা আজ পরিপূর্ণ।

শাহেদের কথা শেষে মাথা তুলে তাকায় ম্যাডাম শাহেদের দিকে। অনুরূপ শাহেদও দেখতে থাকে সোমার দিকে। দু'জনার চোখে নেমে আসে প্রাপ্তির জল।

এতক্ষণে মামা আর ম্যাডামের কথা শুনতে শুনতে আর চোখের জল দেখতে দেখতে চয়নও কেঁদে ফেলেছে নিভৃত্যে। ম্যাডাম তা দেখে চয়নকে কাছে টেনে নেয়। চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে-

তুমি কাঁদছো ?

কোন কথা বলে না চয়ন, মাথা নিচু করে থাকে। শাহেদও ডাকে চয়নকে বলে-

চল, অনেক দেরি হল।

চয়ন ব্যাগ গুছিয়ে নেয়। ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাড়ায় শাহেদ সোমা উঠে দাড়ায় তাদের সাথে। তাকায় শাহেদের দিকে, বলে-

এখনি যাবে ?

মাথা নারিয়ে হ্যাঁ বলে শাহেদ। বলে-

আবার আসব।

একথা বলে ক্রাচের উপর ডান পায়ের ভর দিয়ে চলে যায় গ্রীলের দরজাটার কাঁছে। ফিরে দেখে একবার। এগিয়ে যায় সোমা। একবার দেখে নিয়ে চলে যায় গ্রীলের দরজার বাইরে। হাটতে থাকে চয়ন আর শাহেদ।

সেখানে দাড়িয়ে থেকে গ্রীলের দরজাটার দিকে দেখতে থাকে সোমা। অনেক্ষণ পর নজরটা ফেরায়। দু' চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল ঝড়িয়ে পরতে চায় মাটিতে। মুছে নেয় চোখ দু'টো।

রক্তে আকাঁ বর্ণমালায় মিশে যাচ্ছি ক্রমশই....

সকাল

০১. কারফিউ চলছে ? সমস্যা নেই ! তবুও আজ মিছিলে যাবো ।
আমার হাত থেকে ফেস্টুনটা কেড়ে নিয়েই রাজপথে নামলো । আমি কি যাবো ? ক্লাস আছে যে!!
মিছিলটা এই দিকেই আসছে !! বাকী নেই কেউ ছেলে বুড়ো সব আছে । জনতার ঢল নেমেছে ।
আমি তাকে নিষেধ করলাম । শুনলনা জোর কদমে হেটে গিয়ে মিশে গেলো মিছিলে ।
০২. শালার বাঙ্গাল !!
পেছন থেকে বলে উঠলো এক পাকিস্থানী বুড়ো । জোব্বা পড়া । দাঁতওলা । দোক্তায় মুখ ভর্তি । হাসছে ।
ইচ্ছে করছে টুটি চেপে ধরি ।
এহনি সব কয়ডা গুলি খাইবো, যাইবি তুই সেয়ানা ছেমরি গুলি খাইবি । তাজা রক্তে গুলি খাইলে যন্ত্রণা বাড়ে ।
মিছিলটা আরে বড় হচ্ছে অজগড়ের মতো ।
ভীড়ের ভেতর বাচ্চা টোকাই, বেড়িয়ে এসে বলছে জয় বাংলা !!
গর্জে উঠা আওয়াজ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই! বুড়োটা হেসে বলে বললেই হলো !! শালার টুটি চেপে ধরবো ।
খুলে নেব জিহ্বা ।
০৩. প্রথম পরিচয় এই কলেজেই । নিশীথ সায়েন্স আমি আর্টস ।
দু'পথের দুজন কিন্তু মতের মিল আছে । নিশীথ-নিশি কলেজ জুড়ে এক জুটি । কোন এক সন্ধ্যায়.....
- নিশি গায়ে সাদা এপ্রোন জড়িয়েও আমি মনে হয় ভালবাসতে জানি ।
- তাই তো দেখছি ।
- ভালবাসার দাম দাও?
- কতো দেবো
কথা আর পঙতিমালা জুড়ে গেছে সকাল বিকাল । ভালো লাগাটা আংটি করে হাতে পরেছি;যেন ছুটে না যায় । নিশি আমায় ভালবেসো পাশ করলেই ঘরে তুলবো ।
০৪. হেসে কুটিকুটি হই সত্যি!! হাত ধরে আছে নিশীথ ।
- জানো তোমার মনটা আমার হৃদয়ের ক্যালেন্ডার; আর্কি -১,২,৩ দিন ,মাস,বছর ।
রাত নয় সবে সন্ধ্যা । তখনও শুকতারা জাগেনি । আমাদের অঙ্গিকার দু'জন থাকবো । ভাষার একটা হিরে হলে আরও জমে যাবে ।
হারাবো না পথ । উর্দু বলে সুখ নেই আছে সুখ বাংলায় । আমরাই বা কম কি সে বাঙ্গালী তো ?
০৫. আমি ছুটে চলেছি মা হারার মতো । থমকে গিয়ে হোচট খেয়েছি । রক্তাক্ত শব চারদিকে ।
বারুদের গন্ধ চারপাশে;ধোয়াটে পথ । টেনে হিছরে নিয়ে যাচ্ছে সব । কাল সকালে মিছিল হবে আবার ।
আমার নিশীথ কোথায় । আমি চেতনা হারাবো যদি দেখি রক্তাক্ত । আমার ভালবাসা কি ভাষা খুজতে গিয়ে হারালো ।
রক্তজমাট বাধা নিশীথ লাশ হয়ে গেছে ।
আমি মুঠো ভর্তি শুধু রক্ত আর রক্ত । আমি কি বর্নমালা লিখবো অ -আ- ই । আমি সব হারিয়েছি, পেয়েছি বর্ণমালা এ ভাষা বাংলা ।
আমার চারপাশ শূণ্য হাহাকার । আমি রক্তে আকাঁ বর্ণমালায় মিশে যাচ্ছি ক্রমশই.....

সুসং-দূর্গাপুর

একটা একুশের গল্প

রাকিব হাসান রাজ

জানুয়ারী শেষ। ফেব্রুয়ারী এসেছে। ঘনিয়ে এসেছে সেই দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী। আরও একটাবার বাঙালি বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের নব যাত্রা শুরু হবে। আবারও ফাঁকা ধূলো জমা শহীদ মিনার প্রাণ লাভ করবে। ফুলে ফুলে ভরে উঠবে প্রতিটি স্তম্ভ' বেদীর প্রতিটি অংশ। সেটাকে আর ইট পাথরের মনে হবে না। মনে হবে ফুলের স্তুপ। মিছিল হবে; আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক-সাহিত্য অনুষ্ঠান সব হবে।

অর্নব ভাবতে থাকে। এবার সে ফুল দিবেই দিবে। গতবার ফুল সংগ্রহ করেছিল কিন্তু দিতে পারেনি। সামনে পরীক্ষা বলে বাবা বারণ করেছিল। শুধু তাই নয় ফুলগুলোও ছুড়ে ফেলেছিল। হাজার হলেও তো মাতৃভাষা দিবস। তার বাবাতো কলেজের বাংলারই শিক্ষক। তবে তিনি এমন করলেন কেন? অর্ণব ভেবে পায়নি। এবারও সামনে পরীক্ষা। তাতে কি? ফুল দিবে; তবে ঐ বড় শহীদ মিনারে নয়। এ মফস্বলের কলেজের এক কোনে একটা ছোট শহীদ মিনার। বেচারার জন্ম-ই মিথ্যা। কয়েক বছর ধরে ওটা ফুলের গন্ধই পায়না। ঐ মিনারেই ফুল দিবে অর্ণব। তবে তোড়া নয়, ডালা দিবে। ফুলের ডালা। কিন্তু ডালা বানাবে কিভাবে? কিছুই তো জানে না সে। অবশেষে এক ভাইয়ের কাছে জানতে পারল সাধারণত চালুন দিয়ে ডালা বানানো হয়। টিবি-ফ্রিজের কার্টুনে যে ফোম থাকে তা কেটেও ডালা বানানো যায়।

যেই শোনা; অমনি কাজ। ছাদ থেকে ফোম নামায় অর্ণব। কেটে ডালার আকার বানায়। দুদিন আগেই ফুল সংগ্রহ করতে হবে নচেৎ সব ফুল শেষ হবে যাবে। অনেক খাটুনি-ঘোরাঘুরির পর বেশ কিছু ফুল সংগ্রহ করে। পরিচিত জনের বাড়ি থেকে, আর কিছু চুরি করা। বেশ কতগুলো গাঁদা-গোলাপ পেয়েছে। তার মনে ২১শে দিন ভেসে ওঠে। এ দিন সেই ছোট্ট শহীদ মিনার আর শুন্য থাকবে না। কাল ই ২১শে। ডালায় ফুল সাজাতে শুরু করে সে। ফুল সাজাতে নিজের আঙ্গুল অনেকটা কেঁটে ফেলে। তখন-ই তার মনে নতুন ভাবনা উদয় হয়। রং তো নেই তাই কাঁটা আঙ্গুল টিপে টিপে রক্ত বের করে অর্ণব। তারপর কাঁপা হাতে ডালার মাঝে "অমর একুশে" লেখে। রক্ত তাহলে বৃথা গেল না।

ডালার কাজ প্রায় শেষ অর্ণবের বাবা আজ অনেক ব্যস্ত। কি বক্তৃতা দেবে; ঠিকঠাক করে লিখছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সে অর্ণবের ঘরে ঢুকে। অর্ণব ডালাটা লুকিয়ে রাখতে গিয়েও পারল না।

পড়াশোনা নেই। আজে বাজে দু'টাকার কাজ এহ্! আসিফ খান অর্ণবের বাবা। ফুলের ডালাটা ছুড়ে দেয় বাইরে। বৃথা গেল অর্ণবের শ্রম, তার কাঁটা আঙ্গুলের রক্ত যেমন তেমনি বৃথা যাচ্ছে শহীদদের রক্ত, আমাদের অবহেলায়। ধূসর মাটিতে পড়ে রইল ফুলগুলো।

তার পরেরদিন। সেইব চিরায়ত দৃশ্য যা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। ছোট সেই শহীদ মিনারটি ফুলশুন্য। দু-একটা নেংটো টোকাই ছেলে কোথা হতে জানি কয়েকখানি শিমুল কুড়িয়ে এনে ফেলে রাখল সেই ছোট্ট বেদীতে আর মাঠে বিশাল আলোচনা সভা। বক্তৃতা চলছে। বাংলা ভাষা, মাতৃভাষা দিবস নিয়ে। বক্তৃতার পালা মেয়র, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ শেষে আসিফ খানের ঘাড়ের উপর পড়ল। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। মাইকে বেজে উঠল মিথ্যে আবেগ জড়ানো বাক্য– "বাংলা আমার প্রাণের ভাষা"।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

সিলেটের পথে

ফারজানা আক্তার সুমি

মাঝরাত। দু'চোখে ঘুম নেই। রজনীর নিস্তব্ধতা শীতল করছে আমার মন। পাশের টেবিল ল্যাম্পটি অন অফ করছি আর ভাবছি। তবে কি ভাবছি জানি না।

উঠে জানালা খুলে রাতের আকাশরা দেখছি। তারাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। তার মাঝে একফালি চাঁদ। সব মিলিয়ে ভালই লাগছিল আকাশটাকে।

ভাবছি রাতটা ঘুমাব না। সকালের জন্য অপেক্ষা করব। কারণ রাত পোহালেই সিলেট যাত্রা শুরু। ভাবতে ভালই লাগছিল বিষয়টি।

সকাল এলো। অপেক্ষা প্রহর ইতি টানল। ছোট মামাসহ কুমিল্লায় স্টেশনে পৌছালাম। স্টেশনে প্রচন্ড ভীড়। অপেক্ষায় আছি। কিন্তু ট্রেন আসার কোন নাম নেই। যখনই ট্রেনের শব্দ শুনি ভাবি এই বুঝি ট্রেন এলো। ট্রেন আসে ঠিকই কিন্তু সিলেটে যাওয়ার ট্রেন নয়।

বিরক্তভাবে এপাশ ওপাশ হাটছি। মামারতো পাত্তাই নেই। থাকবেই বা কেমন করে। কানে মোবাইল ফোন লাগালে তো তার কোন খবরই থাকে না।

বিরক্ত আর ভাল লাগল না। মনে হল মাথাটা ফাটিয়ে দেই। আবার ভাবলাম তাহলেতো মরেই যাব। আর আমি মরে গেলে একটি বংশ জন্ম নেয়ার আগে স্বর্গে চলে যাবে। তা আর হলো না।

হঠাৎ ট্রেন এলো ঝকঝক শব্দে দ্রুত গতিতে। মামাও উপস্থিত হলেন। ভীড়ের মাঝে মামা কিভাবে জানি ট্রেনে উঠে পড়লেন। কিন্তু আমি উঠতে পারছি না। হুট করে একটি হাত দেখে ভাবলাম মামার হাত। হাতটি ধরে উঠে পড়লাম ট্রেনে। উঠে দেখি আমার হাত অজানা এক যুবকের হাতে। আমি অবাক চোখে তাকালাম তার দিকে। সে ভেবেছিল আমি একা। আমি ওনার ভদ্রতার ধন্যবাদ জানিয়ে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছি। খুবই উদ্বিগ্ন আমি। অত:পর মামাকে দেখে একটু শান্ত হলাম।

ট্রেনে বসার কোন জায়গা ছিল না। কিছুদুর এগিয়ে সামনের স্টেশনে এসে জানালার পাশে সিটে বসে পড়লাম। এমন সময় একটি মেয়ে এসে আমার পাশের সিটে বসল। তাকে মেয়ে না মহিলা বলে সম্বোধন করব ভেবে পেলাম না। পরনে হলুদ শাড়ি। পায়ে নূপুর। চেহারা যেন আকাশের নক্ষত্র। তাকে নিয়ে অনেক কবিতা লেখা যায়। এক নারী হয়ে অন্য নারীর প্রতি এমন আসক্ত হওয়া সত্যিই হাস্যজনক। তবুও বলা যায় সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। দু'জনেই নীরব। মেয়েটি মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে বাটনগুলো চাপছে। একটু পরে মেয়েটি নিজেই আমার পরিচয় নিল। পরিচয়ের পর আমার কাছ থেকে মোবাইল ফোনটা চাইল সে। ফোন করবে বলে। আমি আপত্তি না করে তার দিকে ফোনটা বাড়ালাম।

কথা শেষে ফোনটা এগিয়ে দেয় আমার দিকে। মুখে বিষন্নতা। তার সম্পর্কে জানার কৌতুহল জাগল আমার। কিন্তু কি দিয়ে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। আস্তে আস্তে কথা শুরু করলাম।

মেয়েটির নাম তিথি। সিলেটে থাকে। কথপকথন একটু গভীরে যেতেই তার ব্যক্তিগত বিষয় জানতে চাইলাম। যেমন বিয়ে করেছেন কি না, পড়াশুনা কতখানি। পড়াশুনায় আবদ্ধ আছেন কি না।

প্রশ্ন শেষে তার দিকে তাকালাম। সে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'অক্ষে বেদনার চাপ। যা আমি মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেকক্ষণ চুপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করে।

আমি সাধারণ ঘরের মেয়ে। বাবা কৃষি কাজ করে। মা গৃহিণী। একটি ছোট ভাইসহ আমাদের ছিল ছোট সংসার। অনেক কষ্টে সামান্য লেখা পড়া করি। যখন ক্লাস নাইনে তখনই আমার জীবনে ঘটে এক অঘটন।

ক্লাস সিক্স থেকে একটি ছেলেকে ভালবাসতাম। তাকে দিয়েই আমার ভালবাসার স্বরলিপি শুরু

হয়েছিল। যতই দিন যায় ততই আমাদের সম্পর্ক গভীরে পৌঁছায়। ভাললাগা থেকে ভালবাসা। ভালবাসা থেকে কাছে আসা।

একদিন সে আমাকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার কথা বলে। প্রথম রাজি না হলে ওর মুখের দিকে চেয়ে আর তিন বছরের সম্পর্কের উপর বিশ্বাস রেখে রাজি হই।

সকাল থেকে দুপুর ওর হাতে হাত রেখে ঘোরাফেরা করি। তারপর আমাকে নিয়ে ওর এক বন্ধুর বাসায় উঠি। শান্তর বন্ধু ইরফান। বাসায় একাই থাকে। আমাদের দেখে ইরফান কোথায় জানি যাচ্ছে। বললাম কোথায় যাচ্ছে? বলল তোমরা কথা বল, আমি কাবাবে হাড্ডি হতে চাই।

বাসায় আমি আর শান্ত। দু'জন দু'জনার চোখে তাকিয়ে। ওর চোখ দু'টো নেশায় ভরা। ঠোঁট দু'টো তৃষ্ণায় কাতর। শান্ত আমার হাত স্পর্শ করে। স্পর্শে কাতর হয়ে বাহুতে ঢলে পড়ি। সে আমায় চেপে ধরে। দু'জনে চোখ বন্ধ করে দু'জনার অস্তিত্ব অনুভব করি। সে আমার চোখে মুখে গালে চুম্বন আঁকে। অফুরন্ত আদর দেয়। যা শেষ হবার নয়। হঠাৎ ইরফানের পায়ের আওয়াজ শুনে দু'জনে নিজেদের আলাদা করে নেই। আমাদের জন্য খাবার এনেছে সে।

খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়ি বিশ্রামের জন্য। শান্ত আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে। দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে তার। কেঁদে ফেলে বলে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। ওয়াদা চায়। যেন কোনদিন তাকে ভুলে না যাই। আমি ওয়াদা করি। তারপর ইরফান ভাইয়াকে বিদায় জানিয়ে চলে আসি আমরা।

তারপর থেকে আমাদের দেখা করার মাত্রা বেড়ে যায়। কখন যে ভালবাসার সম্পর্ক সীমা অতিক্রম করল বুঝতে পারলাম না।

অন্যদিকে আমাদের সম্পর্কের কথা বাবা মা জানতে পারে। বিয়ে ঠিক করে অন্যখানে। কিন্তু আমি কিছু না ভেবে শান্তর সঙ্গে পালিয়ে যাই।

আমরা বিয়ে করি। সংসারটা খুব ভালই যেতে থাকে। আমাদের একটা সন্তান আসে। আমার স্বপ্ন ছেলেকে অনেক লেখাপড়া করাব। কিন্তু ঘটল অন্য ঘটনা। আমার সন্তান হওয়ার পর থেকে শান্তর মধ্যে একটা পবির্তন আসে। ভাল করে কথা বলে না। বেশিরভাগ সময় বাইরে কাটায়। কথায় কথায় আমাকে অপমান করে। আমার চরিত্র নিয়েও কথা বলে। বলে যে মেয়ে বিয়ের আগে শারিরীক সম্পর্ক করে সে আরও অনেক ..... ।

দিন যায় ওর এমন ব্যবহার বাড়তে থাকে। একদিন আমাকে অনেক নোংরা কথা বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। আমার ছেলের বয়স তখন তিন মাস। আমি সিদ্ধান্ত নেই ওর সঙ্গে আমার আর সংসার করা সম্ভব নয়। তবুও চেষ্টা চালালাম সম্পর্ক অটল রাখতে।

কিন্তু পারলাম না। প্রতিটি মূহুর্ত আমার দুঃখের অশ্রু ঝরনা ধারার মত ঝরতে লাগল। ভাগ্যকে বললাম যার জন্য এতকিছু করলাম সে কেন এমন করছে?

আলাদা হয়ে যাই। ছেলেটা আমার কাছেই থাকল।

একটা চাকরী নিই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মা বাবার সামনে যাইনি। যাবই বা কোন মুখে। নটাকে এভাবে কাটিয়ে দিতে চাই। কারও করুণা নিতে চাই না। এই হচ্ছে আমার জীবন কাহিনী। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছে মেয়েটি।

কথার মাঝে আমরা কখন যে সিলেটে পৌঁছেছি টের পাইনি। সে চোখ মুছে বিদায় নিয়ে নেমে পড়ে ট্রেন থেকে। আমরাও ট্রেন থেকে নেমে সিএনজিতে উঠলাম। পথে হঠাৎ মনে হল তিথির কন্টাক্ট নাম্বারটা নেয়া হল না। কথা বলা যেত। হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু তার কথাগুলো মনের ডাইরীর স্থান নিয়ে থাকবে।

আমার মনে পড়ে তিথির কাহিনী। বিরবির করে বলি। এই কথাগুলো শুনে সবারই বোঝা উচিৎ পবিত্র ভালবাসাই স্বর্গ। অপবিত্রতা সুখ দিতে জানে না। ভালবাসতে হয় মনের অনুভূতি দিয়ে। আত্মার মিলন দিয়ে দেহের মিলনে নয়।

বিষ্ণুপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা

দ্বিতীয় চিঠি প্রথম চিঠির পূর্বে

নীরব পথিক

আপনি তিথী?
হ্যাঁ।
আপনার একটা চিঠি আছে।
আমার চিঠি!
হ্যাঁ আপনার চিঠি,
কোথায় দেখি?
তিথী চিঠিটা হাতে নিয়ে পোষ্টমাস্টারকে বিদায় জানায়, এবার চোখ রাখে খামের উপর, কিন্তু প্রাপকের ঠিকানা খুঁজে পায় না। তিথী কিছুটা আশ্চর্য হয়, খাম খুলে চিঠিটার মধ্যে প্রাপকের ঠিকানা খুঁজতে থাকে, কিন্তু চিঠিতেও প্রাপকের ঠিকানা অস্পষ্ট। বিরক্ত হয়ে তিথী চিঠিটা পড়তে শুরু করে।
তিথী,
পদ্ম ফুলের সৌন্দর্য থাকলেও কাটা যুক্ত পদ্ম ফুল তুলতে বিষধর সাপের ছোবল খেতে হয়। রক্তাক্ত হতে হয়, তবুও যারা পদ্ম ফুল ভালবাসে তাদের কাছে রক্ত মূল্যহীন।
আমি জানি তুমি যদি এ কটা লাইনের অর্থ বুঝতে পার তাহলে আমাকেও বুঝতে পারবে, আমি কি বোঝাতে চেয়েছি তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আন্দাজ করতে পেরেছ।
স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তোমাকে বোঝার ক্ষমতা দিন, তুমি ভাল থেকো, শুভ কামনা তোমার জন্য।
ইতি
তোমার কাছের কোন জন।
কয়েকবার পড়ার পর তিথী বুঝতে পারে চিঠির মূল ভাবটা। চিঠি নিয়ে তিথী চিন্তিত নয় তার চেয়ে বেশী চিন্তিত এর লেখককে নিয়ে। তবে তিথী এটা ঠিকই বুঝতে পারে যে, চিঠির লেখক বেশ শিক্ষিত। কারণ চিঠির মধ্যে ভাষার চমৎকার ব্যবহার প্রমাণ বহন করে।
তিন চার দিন যায়, তিথীর মাথা থেকে চিঠির ভূত সরে না। প্রতিদিন স্বাভাবিক কাজ-কর্ম তেমন আর হয় না। দ্বিতীয় চিঠি প্রাপ্তির এক রাশ স্বপ্ন বুকে বাঁধতে থাকে। ব্যাকুল চিত্তে জানতে উদগ্রীব হয় লেখকের পরিচয়। এক প্রকার দূর্বলতা অনুভব করে লেখকের জন্য। হয়তো এটাই ভালবাসার সূচনা পর্ব, এই ভেবে তিথী নিজেই নিজের অজান্তে হাসতে থাকে। আবার নিজেই নিজের মনকে সাবধান করে দেয়। হঠাৎ একদিন পোষ্টমাষ্টার আসে তিথীর কাছে। পোষ্টমাষ্টার দেখে প্রঞ্চলতা ফিরে পায়। এরপর চিঠিটা হাতে নিয়েই পড়তে শুরু করে।
তিথী,
আসক্তি কি জিনিস। আমি এখন এসব থেকে মুক্তি পেতে চাই। আর তুমিই পারো আমাকে মুক্ত করতে। কি করবে না?
আমি আজ প্রথম তোমাকে লিখলাম। তুমি যদি এ চিঠির প্রতিউত্তরে আমাকে একটি চিঠি লিখো তাহলে বুঝবো তুমি আমাকে আগের মন অনুভব করো না। আর যদি লিখো তাহলে বুঝবো আমাকে মুক্ত করতে তুমি ইচ্ছুক। এখন আমি দূর থেকে একের পর এক চিঠি লিখে যাবো, তুমি শুধু ভালোবাসা নিও।
এই দেখ আসল কথাটা তোমাকে বলাই হয় নি, আমি না ক্যান্সার আক্রান্ত। আমাকে ঘৃণা করোনা প্লিজ। ভাল থেকো, সুখে থেকো।

ইতি
তোমার সেরা বন্ধু রুদ্র।

তিথীর চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। এবার বুঝতে পারে যে এটাই রুদ্রের প্রথম চিঠি। আর প্রথম পাওয়া চিঠিটা ছিল রুদ্রের দ্বিতীয় চিঠি। বড় দেরী হয়ে গেছে! তিথী কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। একদিকে রুদ্র তিথীকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, অন্যদিকে তিথীর স্বামী, সন্তান আর একটা সংসার।
অবশেষে তিথী মনঃস্থির করে যে, সে রুদ্রকে দেখতে হাসপাতালে যাবে।
ঠিক পরের দিন তিথী হাসপাতালে যায়। কিন্তু রুদ্রের বেড ফাঁকা! কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছে জানতে পারে রুদ্র আর নেই।
তিথী হাসপাতালের দেয়াল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। আর ভাবতে থাকে ১ম চিঠিটা যদি ২য় চিঠির আগে পেত তাহলে নিজেকে রুদ্রের পাশে অন্যকিছু না হোক ভাল বন্ধু হিসাবে দাঁড়াতে পারত। রুদ্রকে সান্তনার বাণী শোনাতে পারত।

বিপ্লব চন্দ্র ধর

অমূল্য প্রাণ

দেশের জন্য যুদ্ধ করে
শহীদ হয়েছেন যারা,
দেশবাসীর কাছে তারা
সবার চেয়ে সেরা।

এমন ভাগ্য হয়না সবার,
দেশের জন্য যুদ্ধে যাবার
নিজের জীবন ত্যাগ করে
স্বাধীনতা আনবার।

হে বীর লক্ষ শহীদ
জানাই তোমাদের শ্রদ্ধা
এই বাংলা রবে যতদিন

তোমরা বাংলার বুকে অমলিন।
হে শহীদ শ্রেষ্ঠ সন্তান,
ঘুমিয়ে আছ মায়ের কোলে
বাংলা মায়ের প্রাণ।

আমার দেশের শহীদ যারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তারা।
তারাই অমূল্য প্রাণ
বিলীন হবেনা কোন দিন
তাদের অবদান।

দিলীপ সাহা

বন্ধু

চির সবুজের বুকে একেঁ দিলে বন্ধু,
লাল রক্তের আল্পনা
লাল সবুজের পতাকা
তোমার সালম করি।
রক্ত দিলে ভাষা আনলে
ভুলবো তোমায় কেমন করে?
ঘুমিয়ে আছো শান্ত হয়ে
বাংলা মায়ের সবুজ প্রাণে
তোমার রক্তের গর্ব করি
মাতৃ ভাষায় কথা বলি।
রক্ত ঝড়া একুশ এলে
সাজাই বন্ধু সবাই মিলে
লাল সবুজের ফুলে ফুলে
তোমার পাশে হাজার জনতা
অশ্রু ঝড়ায় চোখে।
তোমার স্মৃতি একেঁ রেখেছি
শহীদ মিনার সাজিয়ে।

লেখা আহবান

নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সাহিত্য পত্র ত্রৈমাসিক উচ্ছ্বাস
লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

সম্পাদক
হাফিজুর রহমান হৃদয়
সাপখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।